সত্যে

বিশ্বমানব কল্যাণ

HAQQANI Anjuman
18, Bagmari Road, Kolkata - 700 054

৩৭তম বর্ষ, ৩৭৯ সংখ্যা,
মে ২০২৫

সত্যে বিশ্বমানব কল্যাণ

৩৭তম বর্ষ, ৩৭৯ সংখ্যা, মে ২০২৫

সত্যের স্বরূপ প্রকাশ ও উদঘাটন করাই আমাদের মূখ্য উদ্দেশ্য, কারো বিশ্বাসে আঘাত দেওয়া নয়। তা সত্ত্বেও কেহ আঘাত পেলে তজ্জন্যও ক্ষমাপ্রার্থী। এই সত্যভিত্তিক পত্রিকা সম্পর্কে যে কোন সুষ্ঠু অভিমত শ্রদ্ধার সঙ্গে গৃহীত ও প্রকাশিত হবে। আপনাদের প্রেরিত প্রবন্ধ, কবিতা বা বিষয়ভিত্তিক রচনাগুলি প্রয়োজনে সংযোজন করা হতে পারে।

\- সম্পাদক

সূচীপত্র

সম্পাদনায় - হাক্কানী আঞ্জুমান প্রকাশনী কমিটির পক্ষ হইতে
মাওলানা খুরশীদ আলম ফারুকী (এম.এ) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (এম.এম) কলকাতা মাদ্রাসা কলেজ
২৫, মার্কেট স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০ ০৮৭,
Website : www.haqqanianjuman.com

পবিত্র মেওয়া বৃক্ষ যা সকল সময় মেওয়া বা অমৃত দান করে

পবিত্র মহান কোরবানী, সৃষ্টি কর্তার প্রতি আনুগত্যের নিদর্শণ

কোরবানী অর্থ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আল্লাহর নামে নির্দিষ্ট তারিখে নির্দিষ্ট নিয়মে পশু জবেহ করা, অর্থাৎ জ্বিলহজ্ব মাসের ১০, ১১, ১২ তারিখের মধ্যে উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হরিণ প্রভৃতি হালাল চতুস্পদ পশুকে আল্লাহর নামে জবেহ করা।

কোরবানী করলে অনেক সওয়াব পাওয়া যায়। নবী (সাঃ) বলেছেন, কোরবানীর সময় আল্লাহর নিকট কোরবানীর চেয়ে অধিক প্রিয় আর কোন জিনিস নাই। কোরবানীর সময় কোরবানীই সবচেয়ে বড় ইবাদত। কোরবানীর পশু জবেহ করার সময় প্রথম যে রক্তের ফোঁটা পড়ে, তাহা মাটি পর্যন্ত পৌঁছিবার পূর্বেই কোরবানী আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে যায়। সুতরাং একান্ত ভক্তি ও আন্তরিক আগ্রহের সহিত খুব ভাল জন্তু দেখে কোরবানী করবেন।

রসুল করিম (সাঃ) বলেছেন কোরবানীর পশুর গায়ে যত পশম থাকে প্রত্যেক পশমের পরিবর্তে এক একটি নেকি লেখা হয়।

একটু চিন্তা করে দেখুন। ইহা অপেক্ষা বড় সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হতে পারে? যাকে আল্লাহ ধনী বা আহালে নেসাব করেছেন কোরবানী তাদেরই জন্য কিন্তু যারা আহালে নেসাব নয় তারা সওয়াবের আশায় কোরবানী করতে পারেন। কেননা এই সময় একটা মহামূল্যবান সময় এই সময় চলে গেলে এত অল্প আয়াশে এত অধিক নেকি অর্জনের আর কোন সুযোগ থাকে না। নিজের কোরবানীর সঙ্গে সঙ্গে নিজের মৃত বাপ, মা, পীর, ওস্তাদ প্রভৃতির পক্ষ হতেও কোরবানী করা উচিত। যেন তাদের রুহে সওয়াব পৌঁছে যায়। হযরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর পক্ষ হতে তাঁর বিবি সাহাবানের (আমাদের মাতা গণের) এবং নিজ পীর প্রমুখের পক্ষ হতেও কোরবানী করতে পারলে অতি ভাল। তাঁদের রুহ এই সওয়াব পেয়ে অত্যন্ত খুশী হয়। যাহা হউক অতিরিক্ত করা নফল। কিন্তু নিজ ওয়াজীব রীতিমত আদায় করতে কিছুতেই ত্রুটি করবে না। কারণ আল্লাহর অগণিত নেয়ামত রাশী অহরহ ভোগ করা সত্ত্বেও তাঁরই আদেশ, উদ্দেশ্যে কোরবানী যে না করতে পারে তার চেয়ে হতভাগ্য আর কে আছে?

১) হাদীসঃ- হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ (সাঃ) এক ঈদে ২টি দুম্বা কোরবানী করেছেন। যা হৃষ্ট পুষ্ট সাদা কাল মিশ্রিত রঙের শিং বিশিষ্ট ছিল। তিনি নিজ হাতে জবেহ করেছেন এবং বিসমিল্লাহে আল্লাহু আকবর (আল্লাহর নামে এবং আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ) বলেছেন। আমি তাঁকে এদের পাজরের উপর হাত রাখতে দেখেছি এবং আল্লাহর নামে এবং আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ বলতে শুনেছি। (বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ)

২) হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) একবার শিং বিশিষ্ট পা, পেট ও চক্ষু কালো রঙের দুম্বা কোরবানী করার জন্য আনতে বললেন। অনুরূপ একটি দুম্বা আনা হলে তিনি বললেন, হে আয়েশা। ছুরিটা দাও। অতঃপর বললেন পাথরে তাকে ধারাল কর। হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন আমি তাই করলাম। তিনি ছুরি গ্রহণ করলেন এবং দুম্বাটিকে ধরলেন, তার পর তাকে কাতভাবে শুয়িয়ে জবেহ করতে গিয়ে বললেন 'বিসমিল্লা' আল্লাহর নামে হে আল্লাহ তুমি এটা মহাম্মদ, মহম্মদের পরিবার এবং মহাম্মদের উম্মতগণের পক্ষ হতে কবুল কর। অতপর তা দ্বারা তিনি লোকদের প্রাতঃকালীন খাবার খাওয়ালেন। (মুশলিম শরীফ)

৩) হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলতেন কোরবানীর দিনে আদম সন্তান এমন কোন কাজ করতে পারে না যা আল্লাহর কাছে রক্ত প্রবাহিত করা অপেক্ষা প্রিয়ত্তর হতে পারে। কোরবানীর পশু সকল তাদের শিং, পশম ও খুরসহ কেয়ামতের দিন এসে উপস্থিত হবে। এবং কোরবানীর পশুর রক্ত মাটিতে পড়ার পূর্বেই আল্লাহর কাছে সম্মানের স্থানে পৌঁছে যায়। সুতরাং তোমরা প্রফুল্ল মনে কোরবানী করবে। (তিরমিযী, ইবনে মাযাহ)

৪) হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত রসূলুল্লাহ (সাঃ)

বলেছেন, 'মুছিন্না' (পূর্ণ ৫ বৎসরে উট, পূর্ণ ২ বছরের গরু, পূর্ণ এক বছরের ছাগল ও ভেড়া) ব্যাতীত জবেহ করো না। কিন্তু যদি মুছিন্না সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য হয়, তবে মূষের 'জজয়া' (ছমাস বয়স পূর্ণ হয়েছে অথচ দেখতে পূর্ণ এক বছরের মত) জবেহ করতে পার (মুশলিম শরীফ)

৫) হযরত জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, একটি উট সাত জনের পক্ষ হতে কোরবানী করা যেতে পারে। (মুশলিম শরীফ, আবুদাউদ শরীফ)

৬) হযরত জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কোরবানীর দিনে ২টি সাদা কালো মিশ্রিত রঙের শিংওয়ালা খাসী দুম্বা জবেহ করলেন এবং যখন তাদেরকে কিবলামুখী করলেন, বললেন, আমি আমার মুখমন্ডলকে তার দিকে ফিরালাম যিনি আসমান সমূহ ও যমিনকে সৃষ্টি করেছেন, সকল দিক হতে বিমুখ হয়ে এবং নিজেকে ইব্রাহিমের ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত করে, আর আমি মোশরিক (অংশীবাদীদের) অন্তর্গত নই। উপরন্তু আমার নামায, আমার কোরবাণী, আমার জীবন ও আমার মরণ সকলই বিশ্ব চরাচরের পালনকর্তা আল্লাহর উদ্দেশ্যে, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি এরই জন্য অদিষ্ট বা নিয়োজিত হয়েছি এবং আমি মুসলমানদের অন্তর্গত। হে আল্লাহ! তোমার তরফ হতেই প্রাপ্ত এবং তোমারই জন্য উৎসর্গিত। তুমি কবুল কর। মহাম্মদের পক্ষ হতে এবং তাঁর উম্মতগণের পক্ষ হতে। অতঃপর তিনি বিসমিল্লাহে আল্লাহু আকবর (আল্লাহর নামে, আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ) বললেন এবং জবেহ করলেন। অন্য বর্ণনায়, আপন হাতে জবেহ করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! এটা আমার উম্মতগণের মধ্যে যারা কোরবাণী করতে পারে নি তাদের পক্ষ হতে কবুল কর। (আবুদাউদ, তিরমিযী, ইবনেমাযা)

৭) হযরত ওবাহ বিন আমের (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কতকগুলো ছাগল ভেড়া কোরবাণীর ভার ওক্কাকে দিলেন। বন্টন করার পর একটি বাচ্ছা ছাগল বাকি রইল। তিনি তা রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন তা দ্বারা তুমি নিজে কোরবাণী কর। অন্য বর্ণনায়। আমি বললাম আমার ভাগে তো মাত্র একটি ছাগল রইল। তিনি বললেন তুমি তা দ্বারাই কোরবাণী কর। (বোখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ)

৮) হযরত ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী (সাঃ) ঈদগাহেই কোরবাণীর পশু জবেহ করতেন বা নহর (উট জবেহ, করার বিশেষ পদ্ধতি) করতেন। (বোখারী শরীফ)

৯) হযরত ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসুলুল্লাহ (সাঃ) মদীনাতে ১০ বৎসর অবস্থান করেছেন এবং বরাবর কোরবাণীও করেছেন। (তিরমিযী শরীফ)

১০) হযরত উমেন সালমাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসুল (সাঃ) বলেছেন, যখন জিলহজ্ব মাসের প্রথম দশক আসে আর তোমাদের কেউ কোরবানী করার ইচ্ছা রাখে, সে যেন, নিজের কেশ ও চর্মের কোন কিছু স্পর্শ না করে (না কাটে)। অপর বর্ণনায়, সে যেন কোন কেশ না ছাঁটে এবং কোন নখ না কাটে। অন্য বর্ণনায়, যে ব্যক্তি জিলহজ্ব মাসের চাঁদ দেখবে এবং কোরবাণীর ইচ্ছা রাখবে, সে যেন নিজের চুল এ নিজের নখসমূহ কিছু না কাটে। (মুসলিম শরীফ)

১১) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন, এ দশ দিনের সৎকার্যের চেয়ে অন্য কোন দিনের সৎকার্য আল্লাহর নিকট অধিকতর প্রিয় নয়। সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, আল্লাহর পথে জিহাদও নয়? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদও নয়। শুধু এ ব্যক্তির জিহাদ ব্যতীত যে তার জান মালসহ বের হয় এবং কিছুই নিয়ে ফিরে আসে না। (বোখারী শরীফ)

১২) হযরত তাবেয়ী হানাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি হযরত আলীকে দুটি দুম্বা কোরবাণী করতে দেখলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? (দুটি কেন?) তিনি বললেন, রসুলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে অসিয়ত করে গেছেন, আমি যেন তার পক্ষে কোরবাণী করি। সুতরাং আমি তাঁর পক্ষ হতে কোরবাণী করছি। (আবু দাউদ শরীফ, তিরমিযী শরীফ)

১৩) হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন (কোরবাণীর পশুর) চক্ষু ও কান উত্তমরূপে দেখে নেই এবং আমরা যেন তা দ্বারা কোরবাণী না করি যে পশুর কানের অগ্রভাগ কাটা গেছে, যার কানের শেষ ভাগ কাটা গেছে অথবা যার কান গোলাকারে ছেদিত হয়েছে বা যার কান পার্শ্বের

দিকে ফেড়ে গেছে। (তিরমিযী শরীফ, আবু দাউদ শরীফ, নাসাযী শরীফ)

১৪) হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূল (সাঃ) নিষেধ করেছেন, আমরা যেন শিং ভাঙা, ও কান কাটা পশু দ্বারা কোরবাণী না করি। (ইবনে মাযাহ)

১৫) হযরত বারায়া বিন আজেব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রসূল (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করা হল কোন রকমের পশু কোরবাণী করতে নেই। তিনি বললেন ৪ প্রকার পশু (১) খোঁড়া পশু মার দোষ প্রকাশ্য। (২) অন্ধ পশু, যার অন্ধতা প্রকাশ্য। (৩) পীড়িত পশু, যার পীড়া প্রকাশ্য। (৪) শীর্ণ পশু, মা বলবান হবার নয়। (তিরমিযী শরীফ)

১৬) আবু সাইদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল (সাঃ) শিংওয়ালা শক্তিশালী দুম্বা দ্বারা কোরবাণী করতেন। মার চক্ষু কাল, মুখ কালো এবং পা কালো। (তিরমিযী, আবুদাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাযা)

১৭) হযরত মুজাশে (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুল (সাঃ) বলতেন ছয় মাসের ভেড়া, ১ বছরের ছাগলের স্থান পূর্ণ করে। (আবুদাউদ, নামায়ী, ইবনে মাযাহ)

১৮) হযরত আবু হোরায়রা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুল (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, পূর্ণ ৬ মাসের ভেড়া কতই না উত্তম কোরবাণী। (তিরমিযী শরীফ)

১৯) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসুল (সাঃ) বলেছেন, জিলহজ্ব মাসের প্রথম ১০ দিনের মত এমন কোন দিন নেই যার ইবাদত আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়তর। তার প্রত্যেক দিনের রোজা এক বছরের রোজার সমান এবং প্রত্যেক রাতের নামায কদরের রাতের নামাযের সমান।

কোরবানীর পশু ঃ-

একটি ছাগল বা একটি মেষ একজনের জন্য কোরবানী করতে হয়। একটি গরু বা একটি উট সাত জনের জন্যে হয়। কোরবানীর সময় ১০ই জিলহজ্ব হতে ১২ই জিলহজ্ব পর্যন্ত। গোশতের কিছু অংশ দরিদ্রের মধ্যে কটন করে দিতে হয়। চামড়া দান করতে হয়।

হাদীশ হযরত জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন তিন দিনের অধিক আমরা কোরবানীর গোস্ত খেতে অভ্যস্ত ছিলাম না। রসূল (সাঃ) তা আমাদের জন্য বৈধ করলেন এবং বললেন খাও এবং সঞ্চয় কর। আমরা খেলাম এবং সঞ্চয় করলাম। (বোখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ)

হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল (সাঃ) তাঁর কোরবানীর উট গুলোর তত্ত্বাবধান করতে এবং তাদের গোশত, চামড়া, এবং খুর গুলোকে দান করতে আদেশ দিলেন। এবং জাবেহকারীকে কিছুই দিতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, তাকে আমাদের কাছ থেকে দেব। (বোখারী শরীফ)

কোরবাণী সম্পর্কে কতকগুলো মাসআলা

১) কোরবাণীর গোশত নিজে খাবে, নিজের পরিবার বর্গকে খাওয়াবে। আত্মীয় স্বজনকে হাদিয়া তোহাফা দিবে এবং গরীব মিককিনকে খয়রাত দিবে। মুস্তাহাব তরিকা এই যে, তিন ভাগ করে ১ ভাগ গরীবদেরকে দান করবে। যদি কেহ সামান্য দান করে, তবে গোনাহ হবে না।

২) কোরবানীর চামড়া খয়রাত করে দিবে। কিন্তু চামড়া যদি বিক্রি করা হয় তাহলে তবে ঠিক ঐ পয়সাই গরীবদেরকে দান করে দিতে হবে। ঐ বিক্রিত পয়সা নিজে খরচ করে নিজের পয়সা দান করে দিলে তবে আদায় হয়ে যাবে কিন্তু অন্যায় হবে।

৩) কোরবাণীর চামড়ার টাকা মসজিদ মেরামত বা অন্য কোন নেক কাজে খরচ করা দুরস্ত নাই। খয়রাত করতে হবে।

৪) কোরবাণীর পশু জাবেহকারীকে ও গোসত প্রস্তুতকারী ব্যক্তিদেরকে পারিশ্রমিক পৃথকভাবে দিবে, কোরবাণীর গোশত, চামড়া, কল্লা বা পায়ার দ্বারা দিবে না।

৫) কোরবাণীর পশুর গায়ে যদি কোন পোষাক থাকে তবে উহা এবং দড়ি ইত্যাদি গরীব দিগকে দান করে দিতে হবে।

মদিনা শরিফের যিয়ারতের আদব

- সম্পাদকীয়

আখেরী নবী প্রিয় রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ আমার ইন্তেকালের পরে যে ব্যক্তি আমার যিয়ারত করে, সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করলো। তিনি আরও বলেনঃ- সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি আমার কাছে না আসে, সে আমার প্রতি যুলম করে।

তিনি আরও বলেনঃ- যিয়ারতের উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি আগমন করে এবং আমার যিয়ারত ব্যতীত তার যদি অন্য কোন চিন্তা না থাকে, আল্লাহর যিন্মায় তার হক হয়ে যায় যে, আমি তার সুপারিশকারী হই।

সুতরাং যে লোক মদীনায় যিয়ারত করার ইচ্ছা করে, পথিমধ্যে তার বেশী করে দুরূদ পাঠ করা উচিত। মদীনার দোয়া ও গাছগুলোর উপর দৃষ্টি পতিত হলে সে বলবে হে আল্লাহ! এটা তোমার রসুলের হারম। সুতরাং তুমি একে আমার জন্য জাহান্নাম থেকে বাঁচার উপায় ও মন্দ হিসাব-নিকাশ থেকে মুক্তির কারণ করে দাও।

এরপর কংকরময় ভূমিতে গোসল করবে, সুগন্ধি লাগাবে এবং নিজের ভাল পোশাক পরিধান করবে। এ বিনয় ও তাযীমের সাথে মদীনায় প্রবেশ করবে এবং এই দোয়া পড়বে-আল্লাহর নামে এবং রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর মিল্লাতের ওপর। হে আল্লাহ! আমাকে সত্যের উপর প্রবেশ করাও, সত্যের উপর রেখে বের কর এবং আমার জন্য তোমার পক্ষ থেকে সাহায্য নির্ধারণ কর।

এরপর অত্যন্ত আদবের সাথে মসজিদে নববীর দিকে এগুবে। মসজিদের ভেতরে ঢুকে দু'রাকাত নামায পড়বে মিম্বরকে ডান কাঁধ বরাবর রেখে। চোখের সামনে রাখবে মসজিদের কেবলায় অবস্থিত বৃত্তটিকে। এ স্থানটি ছিল রাসুল (সাঃ) এর দাঁড়ানোর জায়গা।

এরপর রাসূল (সাঃ) এর রওযা মুবারকের কাছে যাবে এবং এমনভাবে দাঁড়াবে যে, পিঠ কাবার দিকে এবং চেহারা থাকবে রওয়া মুবারকের দেয়ালের দিকে। মনে রাখবে দেয়ালের কর্নারের স্তম্ভ থেকে চাঁর হাত দূরে দাঁড়াবে। দেয়ালে হাত লাগাবে না। এখানে দাঁড়িয়ে দরূদ শরীফ পাঠ করবে। এক্ষেত্রে মনে রাখবে, কেউ যদি সালাম পৌঁছানোর কথা বলে তবে বলবে- অমুক লোকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি সালাম।

সালাম তোমার প্রতি হে বিশ্ব পালনকর্তার রসূল। সালাম তোমার প্রতি হে কল্যাণের সরদার। সালাম তোমার প্রতি যে পূণ্য উদঘাটনকারী। সালাম তোমার প্রতি হে দয়াল নবী। সালাম তোমার প্রতি হে উম্মতের পথপ্রদর্শক। সালাম তোমার প্রতি হে নুরের আভায় উজ্জ্বল হাত পা বিশিষ্ট মুমিনদের সরদার। সালাম তোমার প্রতি এবং তোমার পরিবারবর্গের প্রতি, যাঁদের থেকে আল্লাহ অপবিত্রতা দূর করেছেন এবং যাঁদেরকে পবিত্র করেছেন। সালাম তোমার প্রতি এবং তোমার পূত পবিত্র আসহাবগণের প্রতি এবং তোমার পবিত্রতা বিবিগণের প্রতি, যাঁরা মুমিনদের সেই প্রতিদান থেকে উত্তম, যা কোন নবীকে তাঁর সম্প্রদায়ের তরফ থেকে এবং কোন রসূলকে তাঁর উম্মতের পক্ষ হতে দিয়েছেন। আল্লাহ তোমার প্রতি রহমত নাযিল করুন। যখনই স্বরণকারীরা তোমাকে স্মরণ করে এবং যখনই উদাসীনরা তোমার থেকে উদাসীন হয়। অগ্রগামীদের পশ্চাৎগামীদের প্রতি। আল্লাহ আমাদেরকে তোমার মাধ্যমে গোমরাহী থেকে বাঁচিয়েছেন। তোমার মাধ্যমে আমাদেরকে অন্ধত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং অজ্ঞতা থেকে জ্ঞানের পথে এনেছেন। আদি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি এক, তার কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিই যে, আপনি তাঁর বান্দা, রসূল, বিশ্বস্ত, মনোনীত, সৃষ্টির মধ্যে অধিক পছন্দনীয়। আমি সাক্ষ্য সেই যে, আপনি আল্লাহর পয়গাম পৌছিয়েছেন, আমানত যথার্থরূপে আদায় করিয়েছেন, উম্মতকে উপদেশ দিয়েছেন, শত্রুর সাথে জিহাদ করেছেন, উম্মতকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন এবং আমরণ আপন প্রভুর ইবাদত করেছেন। অতএব রহমত নাযিল করুন আল্লাহ আপনার প্রতি, আপনার পবিত্র পরিবারবর্গের প্রতি, শান্তিবর্ষণ করুন, গৌরব, সম্মান ও মাহত্য দান করুন।

এরপর এক সামান্য পরিমাণ সরে এসে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর প্রতি সালাম পড়বে। কেননা, তাঁর মাথা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাঁধের কাছে উপস্থিত। হযরত ওমর (রাঃ) এর মাথা হযরত আবু বকরের কাঁধের। নিকট রয়েছে। তাই আরও এক হাত সরে এসে তাঁকেও সালাম বলবে এবং এই দোয়া পাঠ করবে, হে রাসূলুল্লাহর

উযীরদ্বয় তোমাদের প্রতি সালাম, তাঁর জীবদ্দশা পর্যন্ত দ্বীনের কাজে তাঁর সাহায্যকারীদ্বয় এবং তাঁর পরবর্তী উম্মতের মধ্যে দ্বীনী কাজের ব্যবস্থাপকদ্বয়। তোমরা এক্ষেত্রে তাঁর হাদীস অনুসরণ করেছ এবং তাঁর সুন্নাত মেনে চলেছ। সেজন্য তোমাদেরকে আল্লাহপাক এমন প্রতিদান দিন, যা সেই প্রতিদান থেকে শ্রেষ্ঠ, যা কোন নবীর উযীরদ্বয়কে তাঁর ধর্মের পক্ষ থেকে দিয়েছেন।

এরপর সরে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর শিয়রের কাছে কবর ও আধুনিক নির্মিত পিলারের মাঝখানে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে এবং আল্লাহতাআলার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করবে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর উপর সালাত ও সালাম। প্রেরণ করবে এবং বলবে হে আল্লাহ। তুমি বলেছ এবং তোমার কথা সত্য- নিজেদের উপর অত্যাচার করার পর যদি তারা তোমার কাছে আসে, এরপর আল্লাহর কাছে মাফ চায় এবং রসুলও তাদের জন্য মাফ চায়, তবে তারা আল্লাহকে তাওবা কবুলকারী দয়ালু পাবে।

হে রব। আমরা তোমার নির্দেশ শুনেছি, তোমার হুকুম পালন করে তোমার রসূলের নিকট এসেছি এবং তাঁকে তোমার দরবারে আমাদের অজস্র পাপের ব্যাপারে সুপারিশকারী করেছি। আমরা গোনাহ থেকে তওবা করছি এবং নিজেদের ভুল-ভ্রান্তি স্বীকার করছি। হে রব। আমাদের তাওবা কবুল কর, নবী করীম (সাঃ)-এর সুপারিশ আমাদের ব্যাপারে মঞ্জুর কর এবং তোমার নিকট তাঁর মর্যাদার বদৌলতে আমাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান কর। এরপর বলবে-হে আল্লাহতায়ালা। মুহাজির ও আনসারদেরকে মাফ কর এবং আমাদেরকে মাফ কর এবং আমাদের সেই ভাইদেরকে মাফ কর, যারা আমাদের পূর্বে ঈমানের সাথে দুনিয়া থেকে চলে গেছেন।

এরপর কবর ও মিম্বারেরর মধ্যবর্তী স্থানে গিয়ে দু'রাকাত নামায পড়বে এবং অনেক দোয়া করবে। রসূলে খোদা (সাঃ) বলেন- আমার কবর ও মিম্বরের মাঝখানে বেহেশতের একটি বাগান রয়েছে। আর আমার মিম্বর হাউজে কাওসারের উপর অবস্থিত। সুতরাং মিম্বরের নিকট দোয়া করবে। মিম্বরের নিচের সিড়িতে হাত রাখা মুস্তাহাব। বৃহস্পতিবার দিন ওহুদ পাহাড়ে যাওয়া এবং শহদীগণের কবর যিয়ারত করা মুস্তাহাব। অর্থাৎ ফজরের নামায মসজিদে নববীকে আদায় করে যিয়ারত করতে যাবে এবং সেখানে ফিরে এসে যোহরের নামায মসজিদে নববীতে আদায় করবে। এতে কোন ফরজ নামায মসজিদের জামাআত থেকে ফরত হবে না। আরও মুস্তাহাব হল, প্রতিদিন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রতি সালাত ও সালাম পাঠ করার পর জান্নাতুল বাকী কবরস্থানে যাবে এবং হযরত ওসমান গণী, হযরর হাসান (রাঃ), হযরত ইমাম যায়নুল আবেদীন, ইমাম বাকের ও ইমাম জাফর সাদিকের কবর যিয়ারত করবে এবং হযরত ফাতিমা (রাঃ) এর মসজিদে নামায আদায় করবে। এছাড়া হযরত ইবরাহীম ইবনে রাসুলুল্লাহ (সাঃ), হযরত সফিয়্যা প্রমুখের কবরও যিয়ারত করবে। তাঁরা জান্নাতুল বাকীতেই সমাহিত রয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন- যে ব্যক্তি বাড়ি হতে বের হয়ে মসজিদে কোবায় এসে নামায আদায় করে, তার জন্য এক ওমহার সমান সওয়াব রয়েছে। মসজিদে কোবা সংলগ্ন আরিস কূপের যিয়ারত করবে। এ কূপে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থুথু মোবারক নিক্ষেপ করেছিলেন।

যথাযথ সম্মান প্রদর্শন কার মদীনায় বসবাস করতে পারলে তার সওয়াব অনেক বেশী। রাসুলুল্লাহ (সা) বলেন যে লোক মদীনার কষ্ট সহ্য করে সেখানে বসবাস করে, আমি কিয়ামতের দিন তার জন্য সুপারিশকারী হব।

তিনি আরও বলেন-যে মদীনায় ইন্তেকাল সক্ষম হয়, সে যেন মদীনাতে ইন্তেকাল করে। কেননা, যে কেউ মদীনায় ইন্তেকাল করবে, আমি তার জন্য কিয়ামতের দিন সুপারিশকারী অথবা সাক্ষ্যদানকারী হব।

মদীনার সকল কাজ সমাধা করে মদীনা ত্যাগ করার ইচ্ছে করলে মুস্তাহাব হচ্ছে, আবার রওযা মুবারকে আসবে এবং যিয়ারতের দোয়া পাঠ করবে। এরপর প্রিয় নবী আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর কাছ থেকে বিদায় নেবে এবং আধার যিয়ারতে উপস্থিত হওয়ার তওকীফ দানের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করবে। এরপর ছোট রওযায় দু'রাকাত নামায আদায় করবে। এটা মসজিদের ভেতরকার সেই স্থান, যেখানে নবীজী (সাঃ) দাঁড়াতেন।

মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় প্রথমে বাম পা, পরে ডান পা বাইরে রাখবে এবং এই দোওয়া পড়বে ‘হে আল্লাহ! রহমত নাযিল কর মুহাম্মদ ও তাঁর পরিবার-পরিজনদের উপর। একে তোমার ঘরে আমার শেষ উপস্থিতি করো না। এর জিয়ারত দ্বারা আমার গোনাহের বোঝা নামিয়ে দাও। সফরে নিরাপত্তাকে আমার সঙ্গী কর এবং হে পরম দয়ালু নিরাপদে আমার দেশে ফেরা সহজ কর। আমিন।

হযরত মাওলানা সূফী মুফতী সাবলসিংহপুরী (রহঃ)র পাক জুবানের নূরানী বয়ান

- হযরত মাওলানা সুফী মুফতী মাষ্টর সাহেব (দাঃবাঃ)

হযরত বায়েযীদ একমাত্র আদবের দ্বারা বায়েযীদ হয়েছিলেন। তাঁর মুরশিদ ছিলেন হযরত জাফর সাদিক (রহঃ)। একদিন মুরশিদ জাফর সাদিক (রহঃ) বললেন, হে বায়েযীদ! অমুক তাক থেকে অমুক কিতাবটা নিয়ে এস। বায়েযীদ বললেন, হুযূর কোন্ তাক কোন্ কিতাব। মুরশিদ কিবলা (রহঃ) অবাক হয়ে বললেন, কোন্ কিতাব কোন্ তাক তার মানে? আমার ঘরে একটাই মাত্র কিতাব ও একটাই মাত্র তাক। আর তুমি এতদিন আছ অথচ বলছ কোন্ কিতাব কোন্ তাক। বায়েযীদ বললেন, জী হুযূর আপ নার দরবারে তাক ও কিতাব দেখতে আমি আসি নাই। মুরশিদ বললেন, যাও বাবা তোমার কাজ হাসিল। ফয়েয পাবার একমাত্র পথ হলো আদব ও সমঝ। আদব রক্ষা করতে পারলে তোমার কাজ হাসিল। ৬ লক্ষ বৎসরের ইবাদাত নিয়ে আযাযীল শয়তান হলো শুধুমাত্র বেয়াদবী করার জন্য।

বিশর হাফী (রহঃ)-কে সামান্য একটু আদব ওলী করে দিয়েছেন। তিনি কোন মাদ্রাসাতে পড়েন নাই। বিশর হাফী একজন মদখোর ছিলেন। বিসমিল্লাহ লেখা কাগজ পথে পড়ে আছে দেখে মাতালের দ্বীলে খুব কষ্ট হলো। তিনি সেটাকে তুলে মাথায় করে বাড়ী আনলেন। তাতে আতর মাখিয়ে খুব সম্মানের সহিত উঁচু একটা তাকে তুলে রাখলেন। বিসমিল্লাহ লেখা কাগজকে তাযীম করার জন্য আল্লাহ বিশর হাফীর নাম তাঁর ওলীর দফতরে লিখে নিলেন। সেই দেশের কোন এক ওলীর দ্বীলে আল্লাহ ইলহাম করে জানালেন, হে ওলী! তুমি বিশর হাফীকে বলে দাও, আল্লাহ তাকে ওলী করেছেন। ওলী আল্লাহ বিশ্বাস করলেন না। তিনি মনে করলেন, বিশর হাফী একজন ১নং মদখোর, আর আল্লাহ তাঁকে ওলী করেছেন? পরদিন আবার ঐ একই ইলহাম। বিশ্বাস করলেন না। তৃতীয় দিন আবার ঐ একই ইলহাম। ওলী আল্লাহ আর অবিশ্বাস করতে পারলেন না। যাই হোক সংবাদটা দেবার জন্য তিনি বিশর হাফীর উদ্দেশ্যে চললেন। জিজ্ঞাসা করে করে বিশর হাফীকে খুঁজে পেলেন শরাবখানায়। তিনি শরাব খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছেন। ওলী সেইখানে যে লোক ছিল তাকে বললেন, ভাই বিশর হাফীর যখন জ্ঞান ফিরবে তখন তাকে বলবে, হে বিশর হাফী! আল্লাহ তোমার নাম তাঁর ওলীর দফতরে লিখে নিয়েছেন বিসমিল্লাহ লিখা কাগজকে তাযীম করার জন্য। এইবার বিশর হাফী (রহঃ)-এর নেশা ছেড়ে গেল। বিশর হাফীকে সমস্ত ঘটনা বলা হলো। বিশর হাফী সেই দিন থেকে মদ খাওয়া ছেড়ে দিলেন। সুফী আজানগাছী (রহঃ) বলেছেন, তাঁর দরবারে যদি কেউ আদবের সহিত আসে বা বসে, তাহলে তিনি মুরশিদের খেদমত করে যে ফয়েয পেয়েছেন তা ঐ ব্যক্তি পাবে। সুফী আজানগাছী (রহঃ)-এর দরবারে ফয়েয নেওয়া খুবই সহজ। সূফী আজানগাছীর ফয়েযে আসানি। সুফী আজানগাছী (রহঃ) আমাদের যে ওযীফা দিলেন তা কুরআনের ওযীফা। এই ওযীফা দ্বারা মানুষ ৭২ ফেরকা থেকে বেঁচে যাচ্ছে। তুমি বা তোমরা এই ওযীফাকে তাযীম কর। তুমি যখন মৃত্যু -যন্ত্রণায় পড়ে থাকবে, তখনও যেন এই ওযীফাটা তোমার সাথে থাকে। তাহলে তুমি নবীয়্যীন, সিদ্দীকীন, শুহাদা ও সালেহীনের দলভুক্ত হবে। আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন আল্লাহ তাঁর বোধ শক্তিকে নষ্ট করে দেন। কামিল মুরশিদের ইজাযত নিয়ে সকল কাজ করবে। নিজের ইচ্ছানুযায়ী কোন কাজ করবে না। তোমার কাজ আল্লাহর নবী (সঃ) ও কামিল মুরশিদের ইজাযত থাকলে তবেই হবে তা আল্লাহর কাজ, নচেৎ তা হবে শয়তানের কাজ। আযাযীল এটা বুঝতে পারে নাই।

সে দেখেছে মাটির পুতুল কিন্তু আল্লাহর হুকুমকে সে দেখল না। মুরশিদ কেবলা (রহঃ)-এর হুকুম মোতাবেক সকল কাজ কর। একজন ওলী আল্লাহ শয়তান মরদূদকে জিজ্ঞাসা করল, হে শয়তান মরদূদ তুমি মানুষকে কেমন ভাবে গোমরাহ কর। শয়তান বলল, আমি তাকে ভাল কাজ করতে বলি। তারপর তাকে কুপথে নিয়ে যাই। কোন পীরের মুরীদ মনে করলেন তিনি খুব কামিয়াব হয়ে গেছেন। শয়তান তাকে প্রতিদিন খোয়াবে দেখাল। রাত্রিতে বোরাকে চাপিয়ে বেহেশতে বেহেশতে সায়ের করাতো। অনেকদিন পর একদিন হঠাৎ মুরশিদ কেবলার সহিত মুরীদটির দেখা হলো। মুরশিদ বললেন, বাবা! বেশ কিছু দিন হলো তুমি দরবারে মোটেই আসছ না। মুরীদ বললেন, হুযূর! আমি কামিয়াব হয়ে গেছি। প্রতি রাত্রে ফেরেশতাগণ আমাকে বোরাকে করে বেহেশতে বেহেশতে সায়ের করান। মুরশিদ কেবলা সমস্তই বুঝতে পারলেন। এসব শয়তানের কাজ। তাই তিনি মুরীদকে বললেন, বাবা যখনই তোমাকে শয়তান সায়ের করাবে তখন লা হাওলা পড়বে। প্রতি রাত্রের মত পরদিন রাত্রেও শয়তান তাকে সায়ের করাচ্ছে আর মুরীদ পড়ছেন লাহাওলা ওয়ালা কুওয়াতা।পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল আর দেখল

সে একটা গোভাগাড়ে পড়ে আছে। যে কোন যুক্তি আসুক না কেন, মুরশিদ কেবলা (রহঃ)-এর কাছ হতে তুমি সরবে না। মুরশিদ কেবলা (রহঃ)-এর সহিত তোমার যোগ রাখতে হবে। নচেৎ শয়তান তোমাকে হালাক করে দেবে।

বেআদবী মরদূদের ফল দান করে। আল্লাহ কোন মানুষের উপর কোন রকম যুলুম করেন না। কেবল মানুষই তার নিজের উপর যুলুম করল। নতুন পীর ভাই যারা এসেছেন, পুরানো পীর ভাইদের নিকট হতে শুনে তবেই এই দরবারের নিয়ম জেনে নাও এবং সেই মত চল। চুপ করে বসে থাক। কি, কেন, বলতে যেওনা। কি আর কেন বললে, তোমার সব নষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহর কাছে কি এবং কেন বলেছে শয়তান হয়েছে। নবীর (সঃ) কাছে কি কেন বলেছে কাফির হয়েছে। মুরশিদের কাছে কি কেন বলেছে দিল মোর্দা হয়ে গেছে। তুমি যা জান -না তা বলবে না। শয়তান এই সব কথা বলে। আল্লাহ, নবী (সঃ) ও মুরশিদ কেবলাগণের সম্বন্ধে যা জান না তা বলবে না। শয়তান কথার দ্বারা ঝগড়া ফ্যাসাদ বাধিয়ে দেয়। তুমি ঐরকম কথা বলবে না। তুমি বল, আল্লাহর, আল্লাহর রাসূলের (সঃ) ও কামিল মুরশিদগণের উত্তম কথা। আসান আসান কথা। তাই মুরশিদ কেবলা (রহঃ) বললেন, কারো যদি কোন কথা বলতে হয় তো নামায ও ওযীফার কথা বল। তাহলে তোমার কোন ভুল হবে না। এই দরবারে এসে আদব রক্ষা করতে হবে। খামোশ থাকতে হবে। মুরশিদ কেবলা (রহঃ) যা বলবেন সেই মত চলবে, তা না হলে মরাই শ্রেয়।

একজন ওলী আল্লাহ বলেছেন, আল্লাহর রাস্তায় যারা চলতে চায়, তাদের ৪টা কাজ করা দরকার।

(১) মহব্বত। আল্লাহ, নবী (সঃ) ও কামিল মুরশিদগণকে ভালবাস দুনিয়ার সকল জিনিস অপেক্ষা। এদের প্রতি মহব্বত না থাকলে ঈমান দিলে দাখিল হবে না। ওয়ায়েস কারনী নবী (সঃ)-কে মহব্বত করার জন্য নবীর জুব্বা ও পাগড়ি পেলেন।

জিহাদে নবী (সাঃ)-এর দানদান শহীদ হয়েছিল। এই কথা শোনার পর তিনি বললেন, আমার নবীর দাঁত নাই। আর আমার গালে দাঁত থাকবে? তাই নবীর মহব্বতে পাথর মেরে মেরে গালের সমস্ত দাঁত এক এক করে ভেঙ্গে ফেললেন। হযরত উমর ফারুক ও হযরত আলী অবাক। আমরা জুববা পাগড়ি পেলামনা। একজন পাগল জুব্বা পাগড়ি পেলেন। এই রকম নানা চিন্তা করেছেন। ওয়ায়েস কারনী হযরত উমর ফারুক ও হযরত আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন- আমার জন্য জুব্বা পাগড়ি নিয়ে এসেছ তোমরা কারা? বললেন, আমরা সাহাবা। ওয়ায়েস কারনী বললেন, তোমরা সাহাবা, তোমরা তো নবীর সঙ্গে থাকতে, তবে তোমাদের গালে দাঁত কেন? আমি দানদান শহীদের কথা শুনে আমার গালের সমস্ত দাঁত ভেঙ্গে ফেলেছি। সাহাবীদ্বয় লজ্জিত হলেন। নবীকে তোমার নিজের জানের চেয়ে বেশী মহব্বত করতে হবে। এই রকম মহব্বত থাকলে তবেই তুমি কামিয়াব হবে। হযরত উমর ফারুককে জিজ্ঞাসা করা হল, তিনি নবী (সঃ)-কে কেমন ভালবাসেন। হযরত উমর ফারুক বললেন, খুব ভালবাসি, তবে নিজের জানের চেয়ে নয়। নবী (সাঃ) বললেন, হে উমর! তোমার ঈমান এখনও পাকা হয়নি। কামিল মুরশিদগণকে এইভাবে ভালবাসতে হবে।

সূফী আজানগাছী (রহঃ) একবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তখন একজন মুরীদ বললেন, হে আল্লাহ! আমার আয়ুর পরিবর্তে মুরশিদকে আয়ু দান কর। আল্লাহ তার আবেদন কবুল করলেন। মুরশিদ কেবলা (রহঃ) আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠলেন এবং পীর ভাই মৃতুর মুখে ঢলে পড়লেন। দ্বিতীয় মুরশিদ কেবলা (রহঃ)-এর সময়েও এই রকম ঘটনা দেখা গেছে। আল্লাহর বান্দার মধ্যে এমন বান্দাও আছেন, যারা নিজের জানকে আল্লাহর জন্য সোপর্দ করে দেন। আল্লাহ এদের ভালবাসেন। এই মহব্বত দেখা গেছে নবীর দরবারে, আর তা দেখা যাচ্ছে যামানার মুজাদ্দিদ সূফী আজানগাছী (রহঃ)-এর দরবারে। দুনিয়ার যে কোন লোকসানকে আমরা সহ্য করব, তবে ভয় একটাই কামিল মুরশিদের ডাকে এখানে এসে যেন কোন নাফরমানী না হয়। আর এই দরবারের যত ফয়েয বরকত তা যেন পুরোপুরি নিতে পারি। যারা আল্লাহ, নবী ও কামিল মুরশিদগণকে ভালবাসে তারাই আল্লাহর প্রিয়।

- ক্রমশ

বাবা-মায়ের প্রতি ভালবাসা

- মোসলেমুর আলি খাঁ

সন্তানের জন্য পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় ওলী হলেন বাবা-মা। পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ নিয়ামত হল সন্তানের জন্য পিতা-মাতা। মায়ের ভালবাসার কোনও উপমা নেই, মা মধুর চিরকালই মধুর। মা-ই পৃথিবীর ভালবাসাতে শ্রেষ্ঠ উপমা। আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ) ছিলেন ইয়াতিম, মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় বাবা দুনিয়া ছেড়ে চলে যান। জন্মের মাত্র ৫-৬ বছর পরেই নিভে যায় আমিনা মায়ের জীবন প্রদীপ। পরিণত বয়সে দুধ মা হালিমাকে গায়ের চাদর বিছিয়ে দিতেন আমাদের প্রিয় নবীজি (সাঃ), ঘরের খাদেমা বৃদ্ধা উম্মে আয়মানকে নবীজি (সাঃ) মা বলে ডাকতেন, হিযরতের পর মরু আরবের বহু পথ মাড়িয়ে উম্মে আয়ামান মাদিনায় এল নবীজি (সাঃ) সব কাজ ফেলে বৃদ্ধা মা উম্মে আয়মানের সেবাই লেগে যান। চোখ মুখের পানি মুছে দেন। পা টিপে দেন, উম্মে আয়মানের কাছে মা আমিনার কথা শুনে মাকে দেখা, মায়ের সঙ্গে কথা বলা, আর মায়ের সেবার কত স্বাদ আহ্লাদ জন্মেছে নবীজি (সাঃ) মনে, কিন্তু এই মায়ের মত অমূল্য ধন আগেই হারিয়েছেন আমাদের প্রিয় নবীজি (সাঃ)।

সেই অন্ধকার যুগে স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে তিনি মা জাতিকে উচ্চ মর্যাদার আসনে বসিয়েছেন, হযরত আবু উমামা (রাদিঃ) বলেন মহানবী (সাঃ) কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) সন্তানের উপর মা-বাবার কি অধিকার? নবী (সাঃ) বললেন মা-বাবা তোমাদের জান্নাত অথবা মা বাবাই তোমাদের জাহান্নাম। হযরত মুয়াবিয়া (রাদিঃ) থেকে বর্ণিত মহানবী (সাঃ) বলেছেন মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেস্ত- নাসায়ী শরীফ, আল্লাহতায়ালা বলেন- আর তোমার রব (আল্লাহ) নির্দেশ দিয়েছেন যে তোমরা কেবল তারই ইবাদত করবে এবং মা-বাবার সাথে সুব্যবহার করবে। যদি তাদের মধ্যে একজন কিংবা দুইজনই বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছে যায় তাহলে তাদের খিটখিটে ব্যবহারে বিরক্ত হবে না এবং খেয়াল রাখবে তোমার কোন খারাপ ব্যবহারে পিতা-মাতার মুখ থেকে না কোন উহ্ শব্দ বেরিয়ে যায়। তাদের সঙ্গে তুমি সম্মান দিয়ে কথা বলবে এবং তাদের জন্য দোয়ার মধ্যে থেকে নম্রতার বাহু ঝুকিয়ে দাও। আর তাদের জন্য দোওয়া স্বরুপ একথা বলবে হে আল্লাহ! তাদের দুজনের প্রতি আমার এমন আচারণ করার তৌফিক দাও যেমন তারা আমাকে শৈশবে করেছিল। সুরা বনি ইসরাইল আয়াত ঃ ২৩-২৪ মহান আল্লাহ মায়ের সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক ভালবাসার আরও বিবরণ দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন আর স্বরণ কর যখন আমি বনি ইসরাইলের অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম যে তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারও ইবাদাত করবে না এবং মা -বাবার সাথে উত্তম আচরণ করবে, আত্মীয়-স্বজন ইয়াতিম ও অসহায়দের সঙ্গেও। সুরা বাকারা আয়াত ঃ ৮৩।

পবিত্র কোরআনে আরও বলেছে - তোমরা ইবাদাত কর আল্লাহর এবং তার সাথে কারও শরীক করো না। আর সদ্বব্যবহার (ভাল) কর মা-বাবার সঙ্গে, সুরা নিসা আয়াত ঃ ৩৬।

আর আমি মানুষকে তার মা-বাবার সঙ্গে উত্তম আচরণের নির্দেশ দিয়েছি তার মা কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করে তার গর্ভে ধারণ করে, আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দুবছরে সুতরাং আমার প্রতি এবং তোমার পিতা মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। সুরা লুকমান, আয়াত ঃ ১৪।

ইসলামের জীবন সৌন্দর্য বরাবরই মানুষকে মুগ্ধ করে, মা-বাবার জন্য ও আল্লাহর রাসুল (সাঃ) কথাও উম্মতের হৃদয়ে আবেগরে ঢেউ ভোলে মা-সন্তানের বন্ধন গভীর করে, মায়ের জন্য নবীজির মূল্যবান উপ দেশ শুনে আমরা অনুপ্রাণিত হই। সাহাবী ইবনে মাসউদ (রাদিঃ) বলেন একবার আমি নবী করিম (সাঃ) কে জিজ্ঞাস করলাম কোন কাজটী আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়। তিনি (সাঃ) বলেন সঠিক সময়ে নামাজ

পড়া আমি বললাম তারপর তিনি বলেন মা-বাবার সাথে ভাল ব্যবহার করা আমি আবারও বললাম তারপর তিনি বলেন আল্লাহর পথে কাজ করা। বুখারী। হযরত আবু হুরাইরা (রাদিঃ) বর্ণনা করেন একব্যক্তি নবী (সাঃ) কে বলেন কে আমার ভালো ব্যবহার পাওয়ার সবচেয়ে বেশি হকদার, নবীজি (সাঃ) বললেন তোমার মা-, তারপর, তিনি বলেন তোমার মা-, তারপ র তিনি বললেন তোমার মা, তারপর তিনি বললেন তোমার মা, তারপর তিনি বললেন তোমার বাবা বুখারী -মুসলিম।

আল্লাহ রাসলু (সাঃ) বলেন ঃ তোমরা মা বাবার জন্য যা ব্যায় করবে তা ইবাদাতে গণ্য হবে- বুখারী শরীফ।

শুধু মা বাবা নয় পরিবারের সবার জন্য খরচ করাই ইবাদাত।

স্ত্রী ছেলেমেয়ে সহ পরিবারের সবার জন্য ব্যায় করলে হাদিসে সাদকার সওয়াবের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। পবিত্র কুরআনের বায্য তার তোমার কাছে জানতে চায় তারা কী ব্যয় করবে বল তোমরা যে সম্পদ ব্যায় করবে তা মা-বাবা আত্মীয় ইয়াতীম মিসকিন ও মুসাফিরদের জন্য ব্যায় করো, সুরা বাকারা আয়াত ঃ ২১৫।

শুধু ব্যায় করবে না ইসলাম বলেছে মরে গেলেও সন্তানের সম্পত্তিতে মা বাবার জন্য ইনশাফ ভিত্তিক পাওনা রেখে দেবে, পবিত্র কুরআনের ভাষায় তোমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে যে যখন তোমাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হবে যদি তুমি কোনও সম্পদ রেখে যাও তবে মা বাবা ও নিকট আত্মীয়দের জন্য ব্যায়ভিত্তিক অসিয়ত করবে। এটি মুত্তাকীদের (মুমিন) দায়িত্ব। সুরা বাকারা আয়াত ঃ ১৮০।

মা বাবার জন্য কুরআন দোওয়া শিখিয়েছে - রব্বির হামহুমা কামা রব্বা ইয়ানী সাগীরা- হে আমার রব তাদের দুজনের উপর এমন দয়ার আচারণ কর যেমন তারা শৈশবে আমাদের লালন-পালন করেছে। সুরা বনি ইসরাইল আয়াত ঃ ২৪

মায়ের জন্য প্রার্থনা করেছেন হযরত নূহ (আঃ) তিনি দোওয়ায় বলেছেন হে আমার রব আল্লাহ, ক্ষমা কর আমাকে এবং আমার বাবা মাকে এবং যারা আমার ঘরে ইমানদার হয়ে প্রবেশ করছে। এবং মুমিন নারী পুরুষকেও ক্ষমা কর, তুমি অত্যাচারীদের ধ্বংস করো, সুরা নূহ আয়াত ঃ ২৮।

মা বাবার জন্য প্রার্থনা করেছেন হযরত নবী ইব্রাহিম (আঃ) তিনি দোওয়ায় বলেছেন হে আমাদের রব আল্লাহ যে দিন কিয়ামত কায়েম হবে সে দিন আমাকে এবং আমার পিতামাতা ও মুমিনদের ক্ষমা কর, সুরা ইব্রাহিম আয়াত ঃ ৪১।

তাই আমার মুর্শিদ আল্লামা আজানগাছী (রহঃ) বলেন পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় পীর ওলী তোমাদের পিতা-মাতা। পৃথিবীতে সকলে দোওয়া কবুল না হতে পারে, সন্তানের জন্য পিতা মাতার দোওয়া মিস হবে না।

তাই তোমরা পিতা মাতার সেবা করে জান্নাত হাসিল কর আল্লাহ আমাদের সকলকে পিতা মাতার সেবা করার তৌফিক দান করুন - আমিন।

পবিত্র মদিনা শরীফ ও মক্কা শরীফে হাজী ভাইদের প্রাথমিক কাজ
নবী (সাঃ) এর মাজার শরীফ জিয়ারৎ করা
ও সঠিক ভাবে হজ্জের আহকাম পালন করা

মদিনা শরীফে উপস্থিত হয়েই প্রথমে নবী পাক (সাঃ) এর পবিত্র মাজার শরীফ জেয়ারৎ করিবেন। জিয়ারৎ করার পদ্ধতিঃ প্রথমেই বাবুস সালাম গেট দিয়ে মসজিদে নববীতে প্রবেশ করুন। নক্সাটা একবার দেখে নেবেন। প্রবেশ করেই পূর্বমুখী হয়ে হাঁটতে থাকুন। একটু গেলেই দেখবেন হাজী ভাইয়েরা সব লাইন দিয়ে এগিয়ে চলেছেন। আপনি ও ঐ লাইনে দাঁড়ান। ঐটা হল জেয়ারতের লাইন। আস্তে আস্তে অগ্রসর হতেই বাম দিকে ১নং ফাঁকা জায়গা ওটা হযরত ইসা (আঃ) এর জন্য খালি আছে, ২নং জালি মোবারক বা ছিদ্র ওটা নবী (দঃ) এর পবিত্র মাজার শরীফ। ঐ জালি বা ফুটোর দিকে মুখ করে নবী (সাঃ) কে সালাম দেবেন। আচ্ছালামু আলাইকা ইয়া রসুলুল্লাহ। ৩য় জালি মোবারক হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) এর মাজার শরীফ ঐ জালি বা ছিদ্রের দিকে মুখ করে হযরত আবুবকর সিদ্দিক কে সালাম দিন আচ্ছালামু আলাইকা ইয়া হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) অনুরুপ ভাবে ৪র্থ জালি মোবারক বা ছিদ্রের কাছে গিয়ে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) কে সালাম দিবেন। অতঃপর বাবুলবাকী গেট দিয়ে বের হয়ে বাম দিকে পারে জিবরিল গেট আছে ওখানে ২ রাকাত নফল নামাজ পড়ে মসজিদে প্রবেশ করে ১নং সাহাবাকা চাবতরা (যেখানে সাহাবাগণ বসতেন)। (২) রিয়াজুল জান্নাত (৩) মেম্বারে রসুল (সাঃ) (৪) মাকামে হযরত বেলাল (রাঃ) (৫) সাত সতুন ৭ পিলারের কাছে) (৬) জান্নাতুল বাকী জেয়ারত।

মসজিতে নববীতে আপনাকে ৪০ ওয়াক্ত নামাজ বা জামাতের সহিত পড়তে হবে।

মদিনা শরীফের আদবঃ

ফজর নামাজের পর মসজিদে নববীর বাইরে গাড়ীওয়ালা জেয়ারৎ জেয়ারৎ করে হাঁকছেন। আপনি বা আপনারা ঐ গাড়ীওয়ালার সহিত যোগযোগ করে গাড়ী ঠিক করে নেবেন জেয়ারত করার জন্য। গাড়ীওয়ালা আপনাদেরকে গাড়ী করে নিম্নলিখিত স্থান গুলিতে নিয়ে যাবেন।

(১) মসজিদে কুবা, (২) মসজিদে জুমা, (৩) মসজিদে কেবলা তাইন, (৪) মসজিদে খামসা, (৫) সোহাদায়ে ওহুদ (ওযুদ যুদ্ধে শহীদ সাহাবাদের মাজার) (৬) হযরত ওমর (রাঃ)-র কুয়ো।

মদীনা শরীফ থেকে শেষ বিদায় নেওয়ার দিন পবিত্র মাজার মোবারকে হাজির হয়ে আখেরী সালাম দরুদ জানাতে হবে তারপর কেবলামুখী হয়ে গোনাহ মাফির জন্য দোয়া চেয়ে মদিনা শরীফ ত্যাগ করতে হবে। মদিনা শরীফের কাজ সমাপ্ত।

হে আল্লাহ মদিনা শরীফের সমস্ত কাজগুলি সঠিক ভাবে করার তৌফিক দান করুন।

হজ্ব ও ওমরাহ ঃ-

হজ্বের ফরজ ৩টিঃ (১) এহরাম পরিধান করা, হজ্বের নিয়েৎ করা ও তালবিয়া পড়া। (২) কাবা শরীফ তওয়াব করা। (৩) আরাফাতে অবস্থান করা।

হজ্বের ওয়াজীব ৬টিঃ (১) মুজদালফাতে অবস্থান করা, (২) মীনাতে শয়তানকে কাঁকর মারা, (৩) কোরবানী করা, (৪) মাথা মুন্ডন করা, (৫) শায়ী করা ও (৬) বিদায়ী তওয়াফ করা।

ওমরাহর ফরজ ২টি (১) এহরাম পরা, নিয়েত করা, তালেবিয়া পড়া, (২) কাবা শরীফ তওয়াফ করা (৭ জক্করে ১টা তওয়াফ হবে) তওয়াফ শুরু করার সময় তালবিয়া পড়া বন্ধ করতে হবে।

ওমরাহর ওয়াজীব ২টিঃ (১) সাফা ও মারওয়াতে দৌড়ান, (২) মাথা মুড়ানো।

মদিনা শরীফের সমস্ত কাজ সমাপ্ত হলে মক্কা শরীফে আসার জন্য মোয়াল্লেম সাহেব সমস্ত হাজীভাইদের জানিয়ে দেবেন কোন সময় বাস ছাড়া হবে। বাস ছাড়ার নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্বেই গুপ্ত অঙ্গের লোম, বগলের লোম পরিস্কার করে নখ কেটে ভালো ভাবে গোসল করে পাক সাফ হতে হবে। তারপর মালপত্র সব গোছগাছ করে নিয়ে বাসে চেপে বসবেন। বাস যাথাসময়ে ছাড়বে এবং পথিমধ্যে জুল হোযাইফা নামক স্থানে মোয়াল্লেম সাহেব সকল হাজী ভাইদের বাস হতে নেমে এহরাম পরিধান করতে বলবে। ইহাই মিকাত।

এহরাম, ও তা পরিধানের নিয়ম এহরাম হল সেলাই বিহীন ২ খানা কাপড়, একটা পরতে হবে এবং আর একটা গায়ে দিতে হবে। এহরাম পরার পূর্বে ২ রাকাত সুন্নাতুল এহরাম নামাজ পড়ে এহরাম পরবেন। (নিয়েতঃ

নাওয়াতোয়ান উসল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা রাকাতে সালাতে সুন্নাতুল এহরাম মোতাজ্জেহান এলাজ্জে হাতিল কাবাতেস শরিফাতে আল্লাহু আকবর) এহরাম পরার পর ২ রাকাত নফল নামাজ পড়ে ওমরাহের নিয়েত করবেন। (ওমরাহর নিয়েত আল্লাহুমা লাব্বাইকা ওমরাতান) তারপর উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করতে করতে বাসে গিয়ে উঠবেন। তালবিয়া জারী থাকবে। বাস যথা সময়ে মক্কা শরীফে নিয়ে যাবে। প্রথমেই বাস দাঁড়াবে আপনাদের থাকার ঘরের সামনে যে ঘর মোয়াল্লেম সাহেব আপনাদের জন্য ঠিক করে রেখেছেন। ওখানে বাস হতে নেমে পড়তেই মোয়াল্লেম সাহেবের লোকেরা আপনাদের যার যার থাকার ঘর দেখিয়ে দেবেন ও ঘরের চাবি আপনাদেরকে দিয়ে দেবেন। আপনারা আপনাদের সমস্ত জিনিসপত্র ঘরের মধ্যে রেখে তালাবন্ধ করে চাবিটা গেট কিপারের কাছে দেবেন অথবা গেট কিপারের কাছে থাকা বোর্ডে আপনার ঘরের যে নম্বর সেই নম্বরে চাবিটা ঝুলিয়ে দিয়ে গেট কিপারকে বলবেন এই আমাদের চাবি বোর্ডে রেখে দিলাম। (যে ঘর আপনাদের জন্য দেওয়া হবে সেই ঘরে ৪ থেকে ৫ জন থাকবেন। যারা থাকবেন তাদের নাম ও ঘরের নং দরজায় লেখা থাকবে।)

এইবার উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করতে করতে কাবা শরীফ অভিমুখে রওয়ানা হবেন। এখন হাজী ভাইদের প্রথম কাজ হবে (১) কাবা শরীফ তওয়াফ করা, (২) সায়ী করা, (৩) মাথা মুন্ডন ও এহরাম ত্যাগ করা। আস্তে আস্তে অগ্রসর হলেই কিছুটা যাওয়ার পর মসজিদে হারেম শরীফ দৃষ্টি গোচর হবে। এইবার মসজিদে হারেমে প্রবেশ করে তালবিয়া পাঠ করতে করতে এগিয়ে যাবেন। অগ্রসর হতেই এক সময় পবিত্র কাবা শরীফ দেখা যাবে। ঐ সময়ে তালবিয়া বন্ধ করে কাবা শরীফের দিকে চেয়ে নিজের জীবনের সমস্ত গোনাহ মাফির জন্য কেঁদে কেঁদে দোওয়া চাইবেন। দোওয়া শেষ হলেই কাবা শরীফ চত্বরে নামবেন এবং কাবা শরীফের মুখ বা দরজা কোনদিকে তা একবার দেখে নেবেন। কাবার দরজা পূর্ব দিকে। এইবার দেখবেন মসজিদে হারেমের দক্ষিণ দিকে সবুজ বাতি জ্বলছে। নক্সা অনুযায়ী (নক্সাটা একবার দেখে নেবেন, পৃষ্ঠা ১৮) সবুজ বাতি থেকে দরজার পূর্ব-দক্ষিণ কোন যেখানে হাজরে আসওয়াদ আছে ঐ পর্যন্ত একটা ট্রাক লাইন। ঐ ট্রাক লাইন হতে তাওয়াফ শুরু হবে। ট্রাক দেখে নিলেন। এইবার ট্রাকের পিছনে ফাঁকা জায়গায় গিয়ে ২ রাকাত নফল নামাজ পড়ে ট্রাকে আসবেন। তাওয়াফের নিয়েত করবেন। নিয়াত হে আল্লাহ! আমি তোমার এই পবিত্র ঘরকে ৭ চক্করে তাওয়াফের নিয়েত করছি। তুমি ইহা সহজ কর ও কবুল কর। এইবার হাজারে আসওয়াদের দিকে চেয়ে বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবর বলে হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করে তাওয়াফ শুরু করবেন। তাওয়াফ শুরু থেকে রোকনে ইয়ামানী পর্যন্ত দরুদ শরীফ জারী রাখবেন। কাবা শরীফ বামে রেখে তওয়াফ কার্য্য চলবে। এই সময়ে গায়ের কাপড়টা ডান বগলের নীচে দিয়ে বাম কাঁধের উপর রেখে তওয়াফ করবেন। অর্থাৎ ডান কাঁধ খোলা থাকবে। যেখান থেকে তওয়াফ শুরু হয়েছিল কাবা শরীফ ঘুরে আবার সেইখানে এলেই তবে একবার পাক হলো। এই জায়গায় আসার পর হাজারে আসওয়াদের দিকে চেয়ে ইসরার চুম্বন করতে হবে। বলতে হবে বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবর। এক চক্কর হলো এইভাবে ৭ বার চক্কর দিতে হবে এবং প্রতিবারে হাজরে আসওয়াদকে ইসারায় চুম্বন করতে হবে। প্রকাশ থাকে যে, প্রথম ৩ বার তওয়াফে রমল হবে অর্থাৎ কুঁদে কুঁদে ঘুরতে হবে। তারপর বাকী ৪টা চক্কর স্বাভাবিক ভাবে করবেন। এবং এহরামটা এবার খুলে পুরো গায়ে দিয়েই তওয়াফ করবেন। তওয়াফের সময় প্রতিবারই অর্থাৎ রোকনে ইয়ামানী হইতে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত এই মধ্যবর্তী স্থানে রব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হসানাতাও ওয়াফিল আখিরাতে হাসানাতাও ওয়াক্বিনা আমাবান্নার। ওয়াদখিল নাল জান্নাত। মাআল আবরার, ইয়া আযীযু, ইয়া গফ-ফারু, ইয়া রব্বুল আলামিন। এই দোওয়া পড়বেন। এহরাম পরা অবস্থায় মাথা খোলা থাকবে। তওয়াফ শেষ হলো। এইবার মাকামে ইব্রাহিমের পিছনে গিয়ে ২ রাকাত সুরা ফাতেহার পর সুরা কাফেরুন ও দ্বিতীয় রাকতে সুরা ফাতেহার পর সুরা ইখলাস পড়ে মোনাজাত করবেন অথবা (এক আলহামদো ও তিন কোলহু দিয়ে নামাজ শেষ করবেন)। এই বার মুলতামিম কাবার দরজা ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী জায়গায় দাঁড়িয়ে কাবা শরীফকে স্পর্শ করে কেঁদে কেঁদে গোনাহ মাফির জন্য মোনাজাত করবেন। হাতিম এর মধ্যে ২ রাকাত নফল নামাজ পড়বেন। ভীড়ের জন্য পড়তে না পারলে যে কোন সময়ে পড়ে নেবেন। তওয়াফ পর্ব শেষ হল এবার মাকামে ইব্রাহিম কাবা শরীফের সামনে একটি কাঁচের স্তম্ভ। ওটা কাবা শরীফের পূর্ব দিকে। ওখানে থেকে আরও পূর্ব দিকে যাবেন দেখবেন মসজিদে হারেম শরীফের মধ্যে সারি সারি ড্রাম ও গ্লাস আছে। ওখানে গিয়ে যমযম পানি প্রাণ ভরে পান করে নেবেন। তারপর দক্ষিণ দিকে সোজা যাবেন। দেখবেন ওখানে সাফা

পাহাড়। সাফা পাহাড়ে উঠলেই কাবা শরীফ দেখা যাবে। সাফা পাহাড়ে দাঁড়িয়ে কাবা শরীফের দিকে চেয়ে ওযিফা পড়ে দোওয়া করবেন। দোওয়া শেষ হলে একটু পূর্ব দিকে যাবেন দেখবেন ওখানে সায়ী করার লাইন বা দাগ আছে। ওখানে গিয়ে সায়ীর নিয়েৎ করবেন। হে আল্লাহ আমি সাফা হতে মারওয়া পর্যন্ত সাত বার দৌড়াবার নিয়েত করছি এটা আমার জন্য সহজ কর ও কবুল কর। বলেই বিসমিল্লাহ বলেই মারওয়া পাহাড়ের দিকে হাঁটতে শুরু করবেন। মারওয়া পর্যন্ত পৌঁছালে এক সায়ী হবে, আবার মারওয়া থেকে সাফা পর্য্যন্ত এলে ২য় সায়ী হবে। এইভাবে যাওয়া ও আসা মিলিয়ে ৭ বার হলে মারওয়া পাহাড়ে পৌঁছে যাবেন এবং সায়ী শেষ হবে। সাফা থেকে মারওয়া এবং মারওয়া থেকে সাফাতে আসার সময় যেখানে সবুজ বাতি দেখা যাবে একটা সবুজ বাতি থেকে পরবর্তী সবুজ বাতি পর্যন্ত একটু দৌড়ে যেতে হবে। মেয়েদের দৌড়াতে হবে না একটু জোরে পা চালিয়ে গেলেই হবে। সায়ী শেষ হবে মারওয়া পাহাড়ে ওখানে গিয়ে ওযিফা পড়ে দোওয়া খায়ের করবেন। তারপর বাইরে কাবা চত্বরে এসে ২ রাকাত নফল নামাজ পড়বেন। তারপর মাথা মুন্ডন করে এহরাম খুলে গোসল করে পাক সাফ হয়ে সাধারন কাপড় পরবেন। মহিলারা শুধু মাথার চুলের অগ্রভাগ ১ ইঞ্চি পরিমান কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলবে এবং এহরাম খুলে ফেলবেন। এই সাধারণ পোষাক পরে মাথায় টুপি দিয়ে কাবা শরীফে নামাজ পড়তে যাবেন। নামাজের শেষে যথারিতী ওযিফা ও উরসেকুল পড়বেন এবং মাঝে মাঝে তওয়াফ সায়ী করবেন

এইবার যদি ওমরাহ করতে চান তাহলে কাবা শরীফের পূর্ব/পশ্চিম দিকে গাড়ীওয়ালা চিৎকার করছে ওমরাহ, ওমরাহ বলে, আপনি ঐ গাড়ীতে উঠে আয়েসা। মসজিদে যাবেন। আয়েশা মসজিদে যাওয়ার পথে তালবিয়া জারী থাকবে। আয়েসা মসজিদে যাওয়ার সময় সঙ্গে এহরাম নিবেন। আয়েসা মসজিদে গিয়ে ওযু করে এহরাম পরে ২ রাকাত নফল নামাজ পড়ে ওমরাহের নিয়েত করবেন। আল্লাহুমা লাব্বাইকা ওমরাতান তারপর ঐ গাড়ী করে কাবা শরীফে এসে আগে যেমন ভাবে তওয়াফ করেছেন সেই রকম ভাবে তওয়াফ ও সায়ী করে মাথা আবার মুন্ডন করতে হবে মেয়েদের বেলা শুধু চুলের আগা ১ ইঞ্চি পরিমান কেটে ফেলতে হবে। এইবার এহরাম খুলে গোসল করে স্বাভাবিক পোষাক পরিধান করিয়া কাবা শরীফে আসা যাওয়া করিবেন নামাজ পড়ার জন্য। এটা মনে রাখা একান্ত দরকার যখনই এহরাম পরবেন তখনই মাথা খালি রাখতে হবে। এই রকমভাবে মক্কা শরীফে কাজ চলতে থাকবে। তবে প্রকাশ থাকে যে যতবার ওমরাহ করবেন ততবার আয়েসা মসজিদে যেতে হবে এহরাম ততবার পরতে হবে এবং ততবার নেড়া হতে হবে।।

এই ভাবে মক্কা শরীফে নামাজ তওয়াফ সায়ী করতে করতে এক সময় মোয়াল্লেম সাহেব বলবেন আগামী কাল অর্থাৎ ৮ই জিলহজ্ব আপনাদেরকে মিনাতে যেতে হবে। ওখানে হজ্বের ৫ দিন।

এক নজরে হজ্বের ৫ দিনের করণীয় কাজ সমূহ

তালবিয়া বা লাব্বায়েক দোওয়া লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাবাবায়েক লাব্বায়েকা লা শারীকালাকা লাব্বায়েক, ইন্নাল হামদা, ওয়ান নিয়মাতা লাকা ওয়াল মুল্ক, লা শারীকালাক।

প্রথম দিন ৮ জিলহজ

১। নখ চুল কেটে, ভালো করে সাবান মেখে গোসল করে, আতর লাগিয়ে এহরামের কাপড় পরে, হজ্বের জন্য দুই রাকাত নফল নামাজ পড়ে, (পুরুষগণ) মাথা খুলে দিয়ে হজ্বের নিয়েত করা (হজ্বের ১ম ফরজ)।

নিয়ত আল্লাহ গো, আমি ফরজ হজ্বের নিয়েত করছি তুমি একে কবুল হওয়ার যোগ্যতা দান করো।

২। ইজতেরা ও রমল সহ একটি নফল তওয়াফ করে মাকামে ইব্রাহীমের পেছনে দুই রাকাত নামাজ আদায় করা।

৩। নিজ সুবিধার জন্য সাতচক্রের একটি সায়ী করা।

৪। পুরুষগণ করবে এবং মহিলাগণ নীরবে লাব্বায়েক, বলতে বলতে মীনায় রওনা হওয়া।

৫। মীনাতে জোহর, আসর, মগরেব, ও এশার নামাজ আদায় করা।

৬। মীনাতেই রাত্রি যাপন করা।

লাব্বায়েক বলা চালু থাকবে।

গায়ের চাদরকে ডান বগলের নীচে দিয়ে পরাকে ইজতেবা বলে।

বুকফুলিয়ে শরীর দুলিয়ে সগর্বে পা ঠুকে ঠুকে চলাকে রমল বলে

দ্বিতীয় দিন ৯ জিলহজ্ব

ফজরের নামাজ হতে তাকবীরে তাশরিক পড়া চালু হবে। (পুরুষগণের সরবে এবং মহিলা গণের নীরবে)

৭। ফজরের নামাজ মীনায় পড়ে সূর্যোদয়ের পর মীনা

হতে আরাফাতের দিকে রওনা হওয়া। ৮। জোহরের আগে (রেডিও মারফৎ হলেও) মসজিদে নামেরার ইমামের খুতবা শোনা।

৯। উক্ত ইমামের পিছনে পড়লে, জোহর ও আসর একসঙ্গে আদায় করা। নিজ তাঁবুতে পড়লে স্ব স্ব ওয়াক্তে জোহর ও আসরের নামাজ আদায় করা।

১০। আসর বাদ সূর্যাস্ত পর্যন্ত তাঁবুর বাইরে গিয়ে কেবলামুখী হয়ে, দোওয়া ও মোনাজাতের মাধ্যমে, আরাফাতে হাজির হওয়ার নিয়ত করে, অবস্থান করা। (হজ্বের ২য় ফরজ)।

১১। সূর্য ডুবার সঙ্গে সঙ্গে, মগরেবের নামাজ না পড়ে, আরাফাত হতে মুজদালেফায় রওনা হওয়া।

১২। যত রাতই হোক মগরেব ও এশার নামাজ একসঙ্গে আদায় করা। (এক আজান ও দুই তকবীরে)

১৩। ইবাদত ও মুনাজাতের মাধ্যমে মুজদালেফায় রাত্রি যাপন করা।

১৪। মুজদালেফা হতে ৭৫/৮০ টি কাঁকর সংগ্রহ করে নেওয়া।

সর্বদা লাব্বায়েক বলা এবং ফরজ নামাজ গুলির পরে পরে তাকবীর চালু থাকবে।

তৃতীয় দিন ১০ জিলহজ্ব

১৫। মুজদালেফায় ফজরের নামাজ পড়ে ২/৪ মিনিট (সামান্য কিছুক্ষণ হলেও) অবস্থান করা।

১৬। মীনায় ফিরে গিয়ে কেবলমাত্র বড় শয়তানকে একটি একটি করে সাত বার বিসমিল্লাহে আল্লাহো আকবার বলে কাঁকর মারা।

এখন হতে লাব্বায়েক বলা বন্ধ হবে।

১৭। এরপর কোরবানী করা। ব্যাঙ্কের মাধ্যমে কোরবানীর ব্যবস্থা করলে তাদের বলে দেওয়া সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করা।

১৮। তারপর মস্তক মুন্ডন করা। (এটি অন্যান্য ইমামের মতে হজ্বের ফরজ) এবার স্ত্রী মিলন ছাড়া এহরামের যাবতীয় নিষেধ সমূহ কেটে যাবে।

১৯। এহরামের কাপড় ছেড়ে, সাধারণ পোষাক পরে, মক্কায় গিয়ে তওয়াফে জিয়ারত আদায় করা।

(হজ্বের তৃতীয় ফরজ) প্রথম দিনে ৩নং এ বর্ণিত সায়ী করা না হলে তওয়াফে জিয়ারতের পর করা। সায়ী করা। (এটি ও অন্যান্য ইমামদের মতে ফরজ)

২০। মীনায় ফিরে গিয়ে রাত্রি যাপন করা। ফরজ নামাজগুলির পরে পরে তাকবীর বলা চালু থাকবে

চতুর্থ দিনঃ ১১ জিলহজ্ব

২১। জওয়ালের পরে প্রথমে ছোট শয়তানকে, তার পর মেজ শয়তানকে এবং শেষে বড় শয়তানকে একে একে ৭টি করে মোট ২১টি কাঁকর ছুঁড়ে মারা।

প্রত্যেক বারই বিসমিল্লাহে আল্লাহো আকবার বলে কাঁকড় খুঁড়তে হয়।

ছোট ও মেজ শয়তানকে কাঁকর মারার পর একটু সরে গিয়ে দোওয়া চাওয়া সুন্নত। কিন্তু বড় শয়তান কে কাঁকর মারার পর সঙ্গে সঙ্গে চলে আসতে হবে।

যদি গত কার ১৯ নং এ বর্ণিত তওয়াফ এ জিয়ারাত না করা হয় তাহলে আজ মক্কায় গিয়ে উক্ত তওয়াফ করে নেওয়া এবং প্রথম দিনের ৩নং এ বর্ণিত সায়ী করা না হলে আজ তওয়াফের পর সায়ী

২২। (মক্কা হতে ফিরে এসে মীনায়) রাত্রি যাপন করা।

ফরজ নামাজ গুলির পরে পরে তাকবীর বলা চালু থাকবে।

পঞ্চম দিনঃ ১২ জিলহজ

যদি গত দুদিনে অর্থাৎ ১০ই জিলহজ্ব অথবা ১১ই জিলহজ্ব ১৯নং বর্ণিত তওয়াফে জিয়ারত সম্পন্ন করা না হয় তাহলে আজ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত উক্ত তওয়াফ অবশ্য অবশ্যই আদায় করতে হবে। এবং প্রথম দিনের ৩নং ও বর্ণিত সায়ী করা না হলে তওয়াকের পর উক্ত সামী ও আজ সম্পন্ন করে নিতে হবে।

২৩। জওয়ালের পর গতকালের মত যথারীতি প্রথমে ছোট শয়তান, পরে মেজ শয়তান ও শেষে বড় শয়তানকে একে একে ৭টি করে মোট ২১টি কাঁকর ছুঁড়ে মারতে হবে।

২৪। সূর্যাস্ত্রের পূর্বে মীনা হতে মক্কায় রওনা। কোন কারণে মীনায় থাকা অবস্থায় সূর্যাস্ত্র হয়ে গেলে, মীনাতেই রাত্রি যাপন করতে হবে এবং আগামীকাল ১৩ই জিলহজ্ব তিন শয়তানকে যথারীতি ২১টি কাঁকর ছুঁড়ে মক্কা ফিরতে হবে।

একমাত্র বিদায়ী ও তওয়াফ ছাড়া আলহামদোলিল্লাহ হজ্বের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন হয়ে গেল। মক্কা ছেড়ে বাড়ি ফেরার দিন বিদায়ী তওয়াফ করবেন। অনিবার্য কারণ ঘটলে মহিলাদের জন্য বিদায়ী তওয়াফ মাফ হয়ে যায়।

আপনাকে লাখ লাখ সালাম, কোটি কোটি ধন্যবাদ।

বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যে আল-কোরআন

- মোস্তাক আহমেদ

চন্দ্রের নিজস্ব আলো অস্তিত্বহীন ঃ-

মহান আল্লাহতায়ালা বলেনঃ কত প্রাচুর্যময় তিনি যিনি নভোমন্ডলে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছেন এবং ওতে স্থাপন করেছেন প্রদীপ (সূর্য) ও জ্যোতির্ময় চন্দ্র (ফুরকান-২৫ঃ৬১)।

মহান আল্লাহর বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, সূর্য হল প্রদীপ স্বরূপ অর্থাৎ প্রদীপ যেমন আলো দানে সক্ষম, ঠিক তেমন সূর্যও আলো দানে সক্ষম। এখান থেকে সূর্যের যে নিজস্ব আলো রয়েছে, তা প্রমাণিত হয়। আবার চাঁদকে উপরোক্ত আয়াতে জ্যোতির্ময় বলা হয়েছে। তাই চাঁদের আলো প্রতিফলিত আলো। এর কোনো নিজস্ব আলো নেই। একই আয়াতে সূর্যকে প্রদীপ হিসাবে চিহ্নিত করা এবং চাঁদকে তা না করার মধ্যেও প্রমাণিত হয় যে, সূর্যের নিজস্ব আলো রয়েছে এবং চাঁদের কোনো নিজস্ব আলো নেই। সূর্যের বিকিরিত (প্রতিফলিত) আলোই চাঁদের আলো হিসাবে বিবেচিত হয়।

চাঁদ পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ। পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব ৩ লক্ষ ৮৪ হাজার কিমি। চাঁদের ভর, অভিকর্ষজ শক্তি ও কাম্য দূরত্বে অবস্থানের জন্য পৃথিবীতে বায়ুমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছে। এর ওপর চন্দ্রের নিজস্ব আলো থাকলে কি পৃথিবীতে বায়ুমণ্ডলের অস্তিত্ব টিকে থাকত?

দিবাভাগে মানুষের বিভিন্ন কাজকর্ম, রুজিরোজগার সন্ধান, উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি ইত্যাদি কাজের জন্য যে আলোর প্রয়োজন হয়; তা সূর্যের মাধ্যমে পাওয়া যায়। আসলে স্রষ্টা উপরোক্ত কর্ম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সূর্যকে আলো দানের জন্য সৃষ্টি করেছেন (আল্লাহ অধিক অবগত)। আবার সারাদিন ধরে কর্মব্যস্ততার পর রাত্রে মানুষ নিদ্রাযাপন করে এবং বিশ্রাম নেয়। রাত্রে চন্দ্রের স্নিগ্ধ আলোই এরূপ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপযুক্ত। তাই চাঁদের নিজস্ব আলো না থেকে বরং তার প্রতিফলিত মৃদু ও তাপহীন স্নিগ্ধ আলো থাকাই বাঞ্ছনীয়। উল্লেখ্য যে, সূর্য ও চন্দ্র উভয়ের মাধ্যমে সময় গণনা করা হয়।

স্রষ্টার চন্দ্র ও সূর্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য যাহোক না কেন, উপরোক্ত আয়াতে সূর্যের নিজস্ব আলো আছে, কিন্তু চন্দ্রের কোনো নিজস্ব আলো নেই- বিষয়টি খুব স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয়। প্রাচীনকালে মানুষ ভাবত যে, চন্দ্র তার নিজস্ব আলো বিকিরণ করে। কিন্তু বর্তমানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে প্রমাণ করেছে যে, চন্দ্রের কোনো নিজস্ব আলো নেই। সূর্যের আলোয় সে আলোকিত হয়। সুতরাং, চন্দ্রের আলো প্রতিফলিত আলো। এই বিষয়ে অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ বলেনঃ সেখানে চন্দ্রকে স্থাপন করেছেন আলোরূপে ও সূর্যকে স্থাপন করেছেন প্রদীপরূপে (নূহ- ৭১ঃ১৬)।

মহান আল্লাহ এখানেও কিন্তু সূর্যকে প্রদীপরূপে এবং চন্দ্রকে আলোকরূপে বর্ণনা করেছেন, যা থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, সূর্যের নিজস্ব আলো আছে এবং চন্দ্রের নিজস্ব আলো নেই।

সময় গণনায় চন্দ্র ঃ-

মহান আল্লাহতায়ালা বলেনঃ তিনিই উষার উন্মেষ ঘটান, আর তিনিই বিশ্রামের জন্য রাত এবং গণনার জন্য চন্দ্র ও সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন, এ সব পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ কর্তৃক সুবিন্যস্ত (আনআম-৬ঃ৯৬)।

এখানে মহান আল্লাহ বলেন যে, তিনি চন্দ্র ও সূর্য সৃষ্টি করেছেন গণনার জন্য। মহান আল্লাহর এই বক্তব্য থেকে চন্দ্রের মাধ্যমে সময় গণনার ধারণা অতি স্পষ্ট।

চাঁদ পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ। পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব ৩ লক্ষ ৮৪ হাজার কিমি। চাঁদের কোনো নিজস্ব আলো নেই। সূর্যের আলোতেই তার আলো। চাঁদের এই আলো প্রতিফলিত হয়ে এসে পৃথিবীতে পড়ে জোৎস্না সৃষ্টি করে।

পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদ, পৃথিবীকে প্রায় ২৭-১/৩ দিনে একবার প্রদক্ষিণ করে। এই সময়টাকে চন্দ্রমাস বলে। চন্দ্রের অবর্তনেও একই সময় লাগে।

চন্দ্রমাসের বিভিন্ন দিনে চন্দ্রের আলোকিত অংশের আকৃতির পরিবর্তন ঘটে। চান্দ্রমাসের শুরুতে চাঁদকে যেমন দেখায়, মধ্যভাগে তেমন দেখায় না। যেমন, চন্দ্রমাসের শুরুতে চাঁদকে একটি কাস্তের ফালির মত দেখায়। কিন্তু এর প্রায় ১৫ দিন পর ক্রমপরিবর্তিত হয়ে চাঁদ গোলাকার থালার মত আকৃতি ধারণ করে। চাঁদের আকারের এই রূপান্তরকে চন্দ্রকলা বলে। যে ১৫ দিন চাঁদের আলো কমতে কমতে অমাবষ্যা হয় তাকে কৃষ্ণপক্ষ বলে। শুক্লপক্ষ চান্দ্রমাসের প্রথমার্ধ এবং কৃষ্ণপক্ষ চন্দ্রমাসের শেষার্ধ। আর চাঁদের আলো বাড়ার সর্বাধিক অবস্থাকে পূর্ণিমা বলে (১৫তারিখ)

অমুসলিমদের ভাবনায় আল-কোরআন

- জিয়াউর রহমান

কোরআন বাইবেল বা তৌরাতের নকল নয়

-উইলিয়াম মন্টগোমারী ওয়াট

স্কটিশ প্রাচ্যবিদ উইলিয়াম মন্টগোমারী ওয়াট (১৯০৯-২০০৬) ছিলেন বিংশ শতাধীর একজন জনপ্রিয় ঐতিহাসিক। তিনি এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ পড়াতেন। তিনি ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- 'Mohammad (s): Prophet and Statesman (1961), Philosophy and Theology' (1962), 'What is Islam" (1980) "Islam: A Short History (1999) ইত্যাদি।

এমন অনেক বিষয় আছে যেগুলোতে আল কোরআনের সঙ্গে বাইবেল ও তৌরাতের সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। আর যেহেতু বাইবেল ও তৌরাত আল কোরআনের পূর্বের ধর্মগ্রন্থ তাই অনেকে আল কোরআনকে বাইবেল ও তৌরাতের নকল বলে ধারণা করে থাকেন। এপ্রসঙ্গে বিখ্যাত এই ঐতিহাসিকের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য- 'কিছুকিছু মৌলিক বিষয় যেমন ঈশ্বর এবং বিচার দিবস- ইত্যাদির ক্ষেত্রে আল কোরআনের সঙ্গে বাইবেল ও তৌরাতের বিস্তর সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। তার অর্থ কি কোরআন আসল নয়? তা কিন্তু আদৌ নয়।' ..the Quranic conceptions are broadly identical with those of Judaism and Christianity. Does this mean the Quran is not oiginal ?....Not at all.) (Muhammad At Mecca-P-83)

'নবীজীর (স) হিজরতের পর থেকে অগ্রগণ্য মুসলিমরাই রাষ্ট্র পরিচালনার সাথে যুক্ত ছিলেন যার ফলে আমরা কোরআনের মধ্যে পাই উদ্ভুত বাস্তব সমস্যা সমাধানের নিয়মাবলী যেগুলো যুগের অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক ক্ষেত্র তথা ধর্মীয় আচার পালনের ক্ষেত্রে এক পরিপূর্ণ আইনে পরিণত হয়েছে। ...and consequently we find in the Quran rules for dealing with the practical problems which arose. As the centuries passed these grew into a complete system of law, both public and private as well as prescriptions for the practice of religion.) (Islam A Short History-P-87)

কোরআন মধ্যম পন্থা অবলম্বনের উপর জোর দেয়

-এ এস ট্রাইটন

এ এস ট্রাইটন (১৮৮১-১৯৭৩) ছিলেন বিংশ শতাধীর একজন বৃটিশ ঐতিহাসিক ও লেখক। তিনি এডিনবার্গ, গ্লাসগো এবং আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। তিনি ইসলামের ইতিহাসের উপরে বেশ কয়েকটি পুস্তক রচনা করেছেন যার মধ্যে 'Muslim Theology' (1947), "Teach Yourself Arabic' (1943), এবং 'Islam: Belief and Practices (1951) উল্লেখযোগ্য।

'আল কোরআন টিকে আছে এর মধ্যে নিহিত জ্ঞান যেটা ঐশী জ্ঞান, এর ভবিষ্যৎবাণী এবং এর ভাষার বিশুদ্ধতা ও সাবলীলতার জন্য। এই গ্রন্থের অনুবাদ ও প্রথমদিকের বার্তাগুলোর কয়েকবার অধ্যয়নের ফলে এক শক্তিশালী আবেগ সৃষ্টি হয়। বইটির বেশিরভাগ অংশেই সাধারণ জ্ঞান ও মধ্যম পন্থা অবলম্বনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে, কারণ আল্লাহ কখনও ধর্মকে মানুষের জন্য কঠিন করে তুলতে চান না, এবং সম্ভবতঃ এটাই আল কোরআনের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি।' (It stands alone in its wisdom which is God's wisdom, in its fortelling the future and in the purity and fluency of its language. Even in translation the consecutive reading of several pages of the earlier messages leaves an impression of power. Much of the book is marked by sound common sense, the middle way of for God does not make religion hard for men. Probably this accounts for much of its success.) (Islam Belief and Practice-A 3 Triton-P21)

কোরআনের কোনও অনুবাদই উৎকর্ষতায় এর ধারেকাছে নেই

-এ জে আরবেরি

এ জে আরবেরি (১৯০৫-১৯৬৯) ছিলেন আরবী সাহিত্য এবং ইসলামিক ইতিহাসের উপরে একজন বিদগ্ধ ইংরেজ পন্ডিত। তাঁর রচিত আল কোরআনের ইংরেজি অনুবাদ "The Quran Interpreted (1955) বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। এছাড়াও তিনি আরবী ও পাশি সাহিত্য এবং ইসলাম বিষয়ে বেশ কয়েকটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন।

তিনি তাঁর 'The Quran Interpreted নামক কোরআনের ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকায় লিখেছেন-

'মূল আরবী কোরআনের অলঙ্কার ও ছন্দ এমনই বৈশিষ্টপূর্ণ শক্তিশালী ও আবেগপূর্ণ যে কোরআনের যেকোন অনুবাদ তা সে যতই বস্তুনিষ্ঠ হোক না কেন তা কিন্তু আদি গ্রন্থটির উৎকর্ষতা ও উজ্জ্বলতার ধারেকাছেও নয় বরং একটি অনুলিপি মাত্র। (The rhetoric and rhythm of the Arabic of the Koran are so characteristic– so powerful– so highly emotive that any version whatsoever is bound in the nature of things to be but a poor copy of the glittering splender of the original.)

- ক্রমশ